দারসে কুরআন সিরিজ-৩০

সূরা ফালাক ও সূরা নাসের মৌলিক শিক্ষা

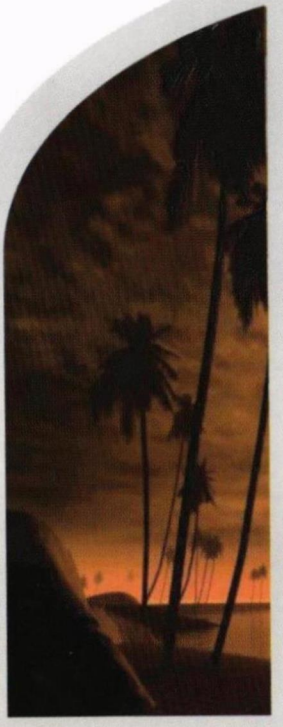

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-৩০

সূরা ফালাক ও সূরা নাসের মৌলিক শিক্ষা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

সূরা ফালাক ও সূরা নাসের মৌলিক শিক্ষা
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১১-৯৬৬২২৯
০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ইং
দশম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০১৫ ইং

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার

মূল্য : ৩০ টাকা

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাদের জন্য

✡ যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।

✡ যারা তাফসীর পড়ার বা শুনার সময় পান না অথচ কুরআন বুঝতে চান।

✡ যারা বড় বড় গ্রন্থ পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন ।

✡ যারা খতীব, মুবাল্লিগ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী ।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য

✡ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা

✡ সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে অর্থ

✡ সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি

✡ নামমাত্র মূল্যে অধিক পরিবেশন

এ প্রয়াসের লক্ষ্য

✡ দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো

✡ লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

ভূমিকা

সূরা ফালাক ও সূরা নাস আল-কুরআনের শেষ দুটি সূরা। এ সূরা দুটি আমরা প্রায় সময় নামাযের মধ্যে পড়ে থাকি। কিন্তু বুঝি না যে, আসলে কি পড়ি। কাজেই এ সূরা দুটির মাধ্যমে আমরা কি যে পড়ি তা বুঝার ও বুঝানোর জন্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। তবে অন্যান্য তাফসীরে আপনারা যে ব্যাখ্যা একবার পেয়ে গেছেন তা আমি বিস্তারিতভাবে লেখার চেষ্টা করিনি এবং এ সূরা দুটির মধ্যে আরো যে বুঝার মত এবং শিক্ষাগ্রহণের মত বহু উপাদান রয়েছে সেটাই সংক্ষিপ্তাকারে এর মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আমার আল্লাহই ভাল জানেন যে, তার বান্দারা এর থেকে কতটুকু উপকৃত হবে। তবে যদি কিছু উপকৃত হন তাহলে আমার চেষ্টাকে আল্লাহ কবুল করেছেন বলে মনে করা যাবে। আর আমি আল্লাহর প্রতি এ আশা পরিপূর্ণভাবেই রাখি যে, আল্লাহ আমার নেক আশা পূরণ করবেন।

ইতি

— লেখক

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

লেখক মাওলানা খন্দকার আবুল খায়ের সাহেব। দারসে কুরআন সিরিজ, সওয়াল জওয়াব সিরিজ ও অন্যান্য যুগজিজ্ঞাসার জবাব সহ মোট ১০০-এর অধিক বই লিখেছেন, যার মধ্য থেকে আমি এমন একখানা দারসে কুরআন সিরিজের পুস্তিকা প্রকাশ করার কাজে হাত দিয়েছি যে পুস্তিকাটি আমার দৃষ্টিতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। আর সত্যিকার অর্থে সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাসের মধ্যে যে মহা মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে তা একমাত্র ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরাই পড়লে ভালো বুঝতে পারবেন।

আমি আশা করি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাই ও বোনেরা আন্দোলনের উপর টিকে থাকার জন্যে শয়তানের ওয়াস ওয়াসা কেমনভাবে আসে এবং কিভাবে তা প্রতিরোধ করা যাবে তার বাস্তব শিক্ষা এর থেকে পেতে পারবেন। এছাড়া আরো পাবেন শয়তানের নাম আল্লাহ আল কুরআনে ১০১বার উচ্চারণ করেছেন, যার মধ্যে ১বার বলা হয়েছে খান্নাস, ১১বার বলা হয়েছে ইবলিস এবং ৮৯বার বলা হয়েছে শয়তান। এ শয়তানের মধ্যে খোদ ইবলিস, জ্বিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছোট্ট বইয়ে তার সবগুলো আয়াত তুলে দেয়া হয়নি তবে কোন্ সূরার কত নাম্বার আয়াতে আল্লাহ শয়তান সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন তা এ বইয়ের শেষের দিকে তুলে ধরা হয়েছে। আপনারা ইচ্ছা করলে সূরার আয়াত নাম্বার দেখে সহজেই তা বের করে পড়তে পারবেন।

পাঠক পাঠিকাদের নিকট দোয়া চাই লেখকের যে সকল বই জনগণের চাহিদা সত্ত্বেও এখনো প্রকাশ করা হয়নি তা যেন আল্লাহ প্রকাশ করার তাওফীক দেন এবং পাঠক পাঠিকাদের নিকট আরো দোয়া চাই আল্লাহ যেন ইসলামী আন্দোলনের এই ত্যাগী ও একনিষ্ঠ খাদেমের সকল খেদমত কবুল করে নেন এবং জান্নাতে উচ্চমর্যাদা দান করেন। আমীন।

ইতি

—প্রকাশক

www.pathagar.com

সূচীনির্দেশিকা

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা ফালাক বা সূরা সুপ্রভাত	৭
সূরা নাস বা সূরা মানুষ	৭
শব্দ বিশ্লেষণ	৮
সূরা নাস	১১
সূরা দুটি মক্কায় অথবা মদীনায় নাযিল হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তি	১৩
সূরা ফালাকের সরল অনুবাদ	১৪
সূরা নাসের সরল অনুবাদ	১৪
নামকরণ	১৪
নাযিল হওয়ার সময়কাল	১৫
বিয়ষবস্তু ও মূল বক্তব্য	১৬
ঐতিহাসিক যোগসূত্র	১৬
ইসলামের ঝাড়-ফুঁকের স্থান	২২
১নং প্রশ্নের জবাব	২৩
২নং প্রশ্নের জবাব	২৪
৩নং প্রশ্নের জবাব	২৪
শেষ প্রশ্নের জবাব	২৪
রাসূল (স)-এর উপর যাদুর ইতিহাস	২৫
এ দুটো সূরা কি আসলেই কুরআনের অংশ?	২৭
এ সূরা দুটির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সাথে মানুষের বিশেষ সম্পর্কের কথা	২৯
রব্বানা বলে কেন মুনাজাত শুরু করি	৩৩
আল্লাহ সব মানুষের মালিক বা বাদশাহ	৩৫
সব মানুষের ইলাহ একমাত্র আল্লাহই	৩৬
সূরার নং সূরার নাম শয়তান নামের আয়াত নাম্বার	৩৭
সূরার নং সূরার নাম ইবলিসের নামের আয়াত	৩৯

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দুটি সূরা যেহেতু একই প্রসঙ্গে এবং একই সাথে নাযিল, তাই এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা একই সাথে দেয়া হলো।

সূরা ফালাক বা সূরা সুপ্রভাত —

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ- وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ-

সূরা নাস বা সূরা মানুষ —

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ- مَلِكِ النَّاسِ- اِلٰهِ النَّاسِ- مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ- الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-

শব্দার্থঃ সূরা ফালাক বা সূরা-সুপ্রভাত (فلق)

قُلْ -বল, اَعُوْذُ - আমি আশ্রয় চাচ্ছি, بِ নিকটে رَبِّ الْفَلَقِ সুপ্রভাতের রবের, (برب الفلق) সুপ্রভাতের প্রভুর নিকট) مِنْ হতে شَرِّ -ক্ষতি - مَا - যা خَلَقَ - সৃষ্টি করেছেন (ক্ষতিকর যাবতীয় বিষয়বস্তু, وَمِنْ - এবং হতে, شَرِّ - ক্ষতি বা অনিষ্ট, غَاسِقٍ – রাত্রির অন্ধকারে আচ্ছন্নকারী, اِذَا - যখন সে আচ্ছন্ন হয়ে যায় وَقَبَ – আচ্ছন্ন হয়, وَمِنْ - এবং হতে,

www.pathagar.com

شَرِّ- ক্ষতি বা অনিষ্ট, النَّفّٰثٰتِ - ফুঁকদানকারীনীর فِى الْعُقَدِ - শিরায়, وَمِنْ شَرِّ - এবং অনিষ্ট হতে حَاسِدٍ - হিংসুকের اِذَا - যখন حَسَدَ - সে হিংসা করে।

সূরা الناس বা মানুষ নামক সূরার শব্দার্থ- قُلْ বল, اَعُوْذُ- আমি আশ্রয় চাচ্ছি, بِرَبِّ النَّاسِ - সব মানুষের প্রভুর নিকট, (এখানে ب অর্থ নিকট) مَلِكِ النَّاسِ সব মানুষের বাদশাহর (নিকট) اِلٰهِ النَّاسِ- সব মানুষের মুনিবের (নিকট) مِنْ شَرِّ অনিষ্ট হতে, (من অর্থ হতে) الْوَسْوَاسِ কুমন্ত্রণা الْخَنَّاسِ বারবার ফিরে আসা শয়তানের। الَّذِىْ- যে, يُوَسْوِسُ কুমন্ত্রণা দেয় বা ওয়াস্ওয়াসা দেয় فِىْ - মধ্যে, صُدُوْرِ- অন্তরে, النَّاسِ -সব মানুষের, مِنَ الْجِنَّةِ - (সে) জ্বিনের মধ্য থেকে, (হোক) وَالنَّاسِ এবং মানুষের মধ্য হতে (হোক)।

শব্দ বিশ্লেষণ —

قُلْ বল, কথাটি আল্লাহ বলছেন তাঁর সেই মনোনিত ব্যক্তিকে যাকে তিনি বাছাই করে নিয়েছেন, তাঁর কথা যা মানুষের জন্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। তাকেই বলছেন যে আমার একথা তুমি লোকদের বলে দাও। এ قُلْ শব্দ ৪টি সূরার প্রথমে এসেছে এবং অপর ৩২৮ স্থানে বিভিন্ন সূরার মধ্যে এসেছে যা সূরা ইখলাসের ব্যাখ্যায় একবার বলা হয়েছে। তাহলে قُلْ শব্দটি মোট ৩৩২ বার আল্ কুরআনে আল্লাহ ব্যবহার করেছেন।

اَعُوْذُ - এর মূল শব্দ হচ্ছে عوذ তার থেকে اَعُوْذُ অর্থ আমি আশ্রয় চাচ্ছি, চাইব এবং চাইতে থাকব। এ শব্দটা আল্ কুরআনে এসেছে ৮ বার।

www.pathagar.com

برب এখানে ب অর্থ নিকটে ..... رب অর্থ অস্তিত্বদানকারী এমন প্রভু যিনি অস্তিত্বদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বাদ বাকী কাজগুলোও করেন। যেমন আল্লাহ মানুষের অস্তিত্ব দানকারী হিসাবে رب الناس মানুষের যখন প্রথম অস্তিত্ব মায়ের পেটে হয় তখন তা থাকে এত ক্ষুদ্র যে তা খালি চোখে দেখাই যায় না। পরে ক্রমান্বয়ে মাত্র ৯$\frac{১}{২}$ মাসের মধ্যে মস্ত বড় একটা শিশু হয়ে ভূমিষ্ট হয়। মায়ের পেটের মধ্যে যিনি তার দেহকে ঠিক জীবিত রাখেন তিনি হচ্ছেন রব। মায়ের পেটে মানুষ যে হারে বাড়ে ঐ একই হারে যদি জন্মের পরে বাড়তে থাকতো তাহলে যেদিন তার বয়স হতো ২১ বছর সেদিন তার দেহের আয়তন হতো গোটা পৃথিবীর সমান। এটা যিনি পাহাড়া দেন তাকে বলা হয় রব। এভাবে তিনি যাই সৃষ্টি করেছেন রব হিসাবে তার সবকিছুকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। এ রব শব্দ কুরআন শরীফে এসেছে ৯৭৮ বার।

الفلق। সুপ্রভাত। দুঃখের পর সুখের প্রভাব বুঝানোর জন্যে এ শব্দটি মাত্র এ এক স্থানেই আল্ কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। شر শব্দটি মূলে شرر পাশাপাশি দুটো ..ر কে এক সাথে সংযুক্ত করে শব্দটাকে করা হয়েছে ... شر - এর অর্থ মানুষের নিকট যত প্রকার অন্যায় ব্যবহার করা সম্ভব তা সবই ঐ شر শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এ শব্দটা আল্ কুরআনে ৩১ বার এসেছে। তবে একবার এসেছে বহুবচনে আর ৩০ বার আসছে এক বচনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ... شر বললেও একটা খারাপী বুঝায় না, সব ধরনের খারাপীই বুঝায়। ما خلق থেকে বুঝান হয়েছে যত প্রকার খারাপী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আসলে মন্দ বলতে যা বুঝায় তা আল্লাহরই সৃষ্টি। আল্লাহ যা সৃষ্টি করেননি তার কোনো অস্তিত্বই আমরা পেতে পারি না। এ জন্যেই এখানে মানুষের এ ধারণাও অপনোদন করা হয়েছে যে যত প্রকার ভাল কাজ আছে তারও خالق বা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং যত প্রকার ভাল কাজ আছে তারও خالق আল্লাহ। যেমন রসূল (স)-কে আল্লাহ পাঠিয়েছেন তেমন শয়তানকেও দুনিয়ায় আল্লাহই পাঠিয়েছেন। কারণ মানুষকে আল্লাহ যে মর্যাদা

www.pathagar.com

দিয়েছেন তার প্রমাণ করতে হলে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলবেন এপরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হতে পারবে সেই হবে বেহেশতে অধিকারী। এ বিষয়ে নিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনা করলে অবশ্যই তা প্রত্যেকেরই মাথায় ধরা পড়বে। غاسق এর মূল শব্দ হচ্ছে. غسق এ মূল শব্দ থেকে উৎপন্ন ৪টি শব্দ আছে আল্ কুরআনে কোথাও আছে غسق اليل কোথাও আছে غساق কোথাও আছে غاسقا অর্থাৎ ৪ স্থানে ৪ আকারে এসেছে। এর প্রত্যেক স্থানে অন্ধকার বুঝানোর জন্যে এসেছে। وقب -এর মূল শব্দ ... وقب - অর্থ প্রবেশ করা বা ঢেকে যাওয়া। ঐটারই তিনটি অক্ষরে জবর দিলে হয় وقب তখনই এর অর্থ দাঁড়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আরবীতে خسف ও وقب প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। وقب শব্দটি আল্ কুরআনে মাত্র এখানেই এসেছে আর কোথাও আসেনি। النفثت - এর মূল শব্দ نفث বা ফুঁক দেয়া এখানে মন্ত্র পড়ে কোনো কিছুতে ফুঁক দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর থেকে যখন نفثت ..... বলা হয় তখন অর্থ দাঁড়ায় আনেক আনেক ফুঁকদানকারী একজন পুরুষ অথবা অনেক অনেক ফুক দানকারীনি নারীরা। এখানে রসূলুল্লাহকে (স) যাদু করেছিল লবীদ নামে একজন পুরুষ এটাও হতে পারে অথবা লবীদের বোনেরা যারা লবীদে চেয়ে বড় যাদুকর ছিল তারাও হতে পারে কিন্তু মূল হোতা যে লবীদ এতে কোনো সন্দেহ নেই। وقد - বহুবচন এর একবচন وقدة অর্থ গিরা - এ গিরা অর্থ রশি বা সুতায় যে গিরা দেয়া হয় ঐ গিরা। এটা হাতে পায়ের গিরা নয়। এ শব্দটা আল্ কুরআনের আর কোথাও নেই। حاسد - এর মূল শব্দ হিংসা। আর حاسد হিংসুক, এর মূল শব্দ থেকে উৎপন্ন ৫ রূপে ৫টি ৫ স্থানে আল্ কুরআনে রয়েছে। حسد মাত্র এখানেই এসেছে এর অর্থ যখন সে হিংসা করে। মানুষ কারো প্রতি হিংসা করে যদি হিংসাত্বক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় তখন তার শক্তিতে কুলায় এমন সব ধরনেরই ক্ষতি তারা করতে পারে।

www.pathagar.com

সূরা নাস

এ সূরার মধ্যে আল্লাহর এমন ৩টি নামের পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং এ ৩টি গুণবাচকের নামের সাথে মানুষের যে সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন তা বুঝার অনুভূতি একমাত্র মানুষেরই আছে। অন্য কোনো জীবের নেই। আর মানুষ যদি একমাত্র আল্লাহকেই রব, মালিক ও ইলাহ হিসাবে মানার হক আদায় করে মানতে পারে তবে নির্ঘাত তার জন্যে পরকালে কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। সে বেহেশতের হকদার হয়েই মরবে। আমার মনে এতে একবিন্দু পরিমাণও সন্দেহ নেই। এরপর বুঝতে হবে مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ। এর মূল অর্থ কি شر এর অর্থ তো ইতিপূর্বে শুনেছেনই। এখন দরকার এর অর্থ বুঝার। ওয়াস্ ওয়াসা হচ্ছে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়া যার কারণে তার মনের মধ্যে এমন সব ধারণার জন্ম হবে যে ধারণা একটা মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেবে অথচ সে টেরই পাবে না। এটাই হল ওয়াস-ওয়াসা। এর কিছু উদাহরণ দেয়া দরকার মনে করছি, তাই কিছু উদাহরণের সাহায্যে বুঝানোর চেষ্টা করবো বাকি আল্লাহর ইচ্ছা। ধরুন, কারো মনে এরূপ ধারণা হল যে, টিভির নাটক, ভিসি, আর, এমন কি যা খারাপ কাজ এর মধ্যেও শিক্ষার কিছু রয়েছে। এই যে, সে ধারণা করলো এটা কি-ইবা খারাপ কাজ এটাই হল একটা শয়তানী ওয়াস-ওয়াসা। এরপর কারো মনে ধারণা সৃষ্টি হল নামায তো পড়েই থাকি। এতেই বেহেশত মিলবে। বেহেশতের জন্যে আবার ইসলামী আন্দোলন, জিহাদ ইত্যাদির কি দরকার। এটাও যে একটা শয়তানী ওয়াস-ওয়াসা তা সে টেরই পায় না। এরপর মনে করুন কারো মনে ধারণা হলো যার যার ধর্ম সেই যদি পালন করে অর্থাৎ হিন্দুরা পূজা করে, খৃস্টানরা গির্জায় প্রার্থনা করে, কেউ সূর্যকে সিজদা করে যদি তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করে তবে তারা কেন পরকালে বেহেশত পাবে না, অব্যশই পাবে। এ ধারণা একজন নামাযি লোকের মধ্যেও সৃষ্টি হয় তা আমি নিজে দেখেছি। আমাকে এমন এক ব্যক্তি এরূপ বলেছেন যে, যার যার ধর্ম পালন করলে সে নাজাত পাবে তিনি একজন তরীকাপন্থী। যাকের মুসল্লি মুমিন বলে তিনি সমাজে পরিচিত। এ ধারণা যে শয়তানী ওয়াস-ওয়াসা তা তিনি টেরই পাননি। এরূপ যে কত লোকের ধারণা আছে তা শুনে শুমার করার কোনো পথ নেই। এ ছাড়া

www.pathagar.com

এভাবেও ওয়াস-ওয়াসা সৃষ্টি হতে পারে যে, কার নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন করব। অমুক ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলন করেন তার দাঁড়ি খাট। কিন্তু একথা তার মনে ধারণা হয় না যে দাঁড়ি খাট করা তো ফরয ওয়াজিববের খেলাফ নয়। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে থাকলে যে সে অত্যন্ত জরুরী ফরয কাজ থেকে নিজেকেই সরিয়ে রেখেছে এটা তার মনে ধরবে না, পক্ষান্তরে দাঁড়ি খাট এটাই তার নজরে পড়বে। এটাও তার শয়তানী ওয়াস–ওয়াসা এভাবে শয়তানী ওয়াস–ওয়াসায় মানুষ মাজার পূজা, কবর পূজা ইত্যাদি কাজও করতে পারে। শয়তানী ওয়াস–ওয়াসা এরূপও হতে পারে যে, যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করে তারা মুসলমানদেরকে মূল ইসলাম থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কাজেই তাদের বিরোধিতা করা একটা নেকের কাজ এটাও শয়তানী ওয়াস-ওয়াসা। শয়তান মুসলমানদের মধ্যে এমনও ধারণা সৃষ্টি করে দেয় যে, যারা ইসলামের মধ্যে রাজনীতি টেনে আনে তারাই ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু তারা দাজ্জালের চ্যালা, কাজেই এদের হত্যা করতে পারলে অনেক অনেক সওয়াবের কাজ করা হবে। এটাও যে শয়তানী ওয়াস–ওয়াসা তা সে বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারে না। এভাবে শয়তান ওয়াস-ওয়াসা দেয় যে, তুমি যাদের সাথে ইসলামী আন্দোলন কর তাদের অমুকের মধ্যে ঐ দোষ আছে। এটাও শয়তানী ওয়াস-ওয়াসা। এমন কি আমাকে একজন মানুষ একদিন বলেছিলেন যে, আপনি যাদের সাথে ইসলামী আন্দোলন করেন তাদের মধ্যে অমুক মাওলানা সাহেব আপনার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করেছেন। আমি সাথে সাথে তার জবাব দিলাম আমার কোনো দ্বীনি ভাই আমাকে খারাপ বলেছে, তাতে আপনার কি, আপনাকে তো আর খারাপ বলেন কাজেই আপনার তাতে মাথা ব্যাথা কেন? আরেক দিনের একটা মজার ঘটনা, একদিন আমাকে একজন বলেছে যে আপনার অমুক মেয়ে আপনাকে গালাগালি করেছে। আমি তাকে বললাম আমার মেয়ে গালি দিয়েছে তাতে তোমার কি, আর তোমাকে এ খবরটা দেয়ার জন্যে আমি তোমাকে কোনো চাকুরী দিয়েছি? সে বেচারা বেওকুফ হয়ে গেল, এভাবে একেবারে ছেলে-মেয়ের মত আপনজনকেও শত্রু বানানোর জন্যে জ্বিন শয়তান বা মানুষ রূপী শয়তান ওয়াস-ওয়াসা দিয়ে থাকে, যার কারণে বহু ধরনের অনিষ্ট সৃষ্টি হতে পারে। তাই কোনো ধরনের ওয়াস-ওয়াসা যেন শয়তান না দিতে পারে তার জন্যে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এ সূরার মাধ্যমে। এ ওয়াস–ওয়াসা শব্দ

www.pathagar.com

আল-কুরআনে ৫ বার এসেছে, এসেছে বিভিন্ন রূপে তবে একই অর্থ দেয়ার জন্যে এসেছে। আর خناس শব্দটি خنوس শব্দ থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ প্রকাশিত হওয়ার পর তা আবার গোপন হয়ে যাওয়া। তার থেকে خناس আধিক্য বুঝানোর মত একটা শব্দ। যার অর্থ দাঁড়ায় বার বার ফিরে আসা এবং এভাবে বার বার ফিরে আসতে থাকা শয়তানকে এ কারণে খান্নাস বলা হয় যে, সে মানুষকে বিপথগামী করার জন্যে সে বার বার মানুষের কাছে ফিরে আসে। সে কোনো মানুষ সম্পর্কেই নিরাশ হয় না। ভাবে আজ না হয় কাল তাকে দিয়ে আমার কথা শুনাতে পারবই। তাই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্যে বার বার ফিরে আসে এজন্যেই শয়তানের এক নাম খান্নাস। আর صدورالناس অর্থ হয় মানুষের অন্তর। خناس শব্দটি এখানে মাত্র ১ বারই এসেছে আল- কুরআনে এখানে এ শব্দ দ্বারা বার বার ফিরে আসা শয়তানকে বুঝানো হয়েছে আর এক জায়গায় আছে অর্থাৎ সূরা তাকবীরে (৩০ পারায়) আছে فلا اقسم بالخناس এখানে خناس আবর্তনশীল তারকা বুঝানো হয়েছে যে তারকা একবার ডুবে গেলে একেবারে চলে যায় না। আবার ফিরে আসে এবং কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত এরূপ তারা ডুববে আবার উঠবে। ঠিক সেই রূপই শয়তান নিরাশ না হয়ে বার বার ঐ তারকার মতো একই নিয়মে ফিরে যায় আবার চলে আসে।

এ ছাড়া আল-কুরআনে আর কোথাও এ শব্দ আসেনি।

সূরা দুটি মক্কায় অথবা মদীনায় নাযিল হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তি

যারা বলেন, এ দুটো সূরা মদীনায় নাযিল হয়েছে তাদের জোরাল যুক্তি হচ্ছে এই যে —

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ

www.pathagar.com

কথার সম্পর্ক রয়েছে রাসূল (স) মাদানী জীবনের সাথে। কারণ তখনই হুজুর (স)-কে ফুঁক দিয়ে যাদু করার ঘটনা ঘটেছে। কাজেই মাদানী সূরা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এটা হচ্ছে একটা যুক্তি। কিন্তু এর যুক্তি হচ্ছে এই যে, সূরা দুটি যদি মদীনায়ই নাযিল হবে তাহলে রাসূল (স) স্বপ্নে দুজন ফেরেশতা আপোষে কথপকথনের মাধ্যমে একথা কেন বলেন যে, অমুক যাদু করেছে, এ যাদু কাটানোর জন্যে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে আছর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। একথা তো দুই ফেরেশতা আপোষে বলাবলি করেছে। এভাবে তো কোনো সূরাই নাযিল হয়নি। সূরা নাযিল হয়েছে সব সময়ই জাগ্রত অবস্থায়। এ ঘটনার দ্বারা বুঝা গেল যে, এ সূরা দুটো পুর্বেই নাযিল হয়েছিল যার কারণে রাসূল (স) সূরার নাম শুনেই বুঝতে পেরেছেন। এ যুক্তিটাই হচ্ছে পূর্বের যুক্তির চেয়ে অধিক জোরাল যুক্তি। এ জন্যে এ দুটি সূরাকে মাক্কি সূরা হিসাবে লেখা হয়েছে।

সূরা ফালাকের সরল অনুবাদ —

বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকালের প্রভুর নিকট সেসব জিনিসের অনিষ্ট হতে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট হতেও যখন সে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং গিরায় ফুঁকদানকারীর অনিষ্ট হতে আর হিংসুকের অনিষ্ট হতেও যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাসের সরল অনুবাদ —

বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সব মানুষের যিনি প্রকৃত রব বা প্রভূ। সব মানুষের যিনি প্রকৃত বাদশাহ ও সব মানুষের যিনি প্রকৃত মুনিব হুকুমদাতা ও আইনদাতা ইলাহর নিকট এবং আশ্রয় চাচ্ছি বার বার ফিরে আসা ওয়াস-ওয়াসা দানকারী শয়তানের অনিষ্ট হতে, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা বা ওয়াস-ওয়াসা দান করে তার অনিষ্ট হতে তা সে জ্বিনের ভিতর থেকেই হোক বা মানুষের ভিতর থেকেই হোক।

নামকরণঃ এ দুটি সূরা যেহেতু একই উদ্দেশ্যে এবং একই বিষয়ের উপর নাযিল হয়েছে তাই এ দুটো সূরার এক সাথে একটা নাম আছে। আর সূরা দুটি যেহেতু আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার সূরা তাই এর এক সাথে নাম হচ্ছে সূরায়ে "মাওয়াওবিজাতাইন" বা "আশ্রয় প্রার্থনার" দুটি সূরা আর যেহেতু এ সূরা দুটোকে পৃথক সূরা হিসেবে আল্লাহ

www.pathagar.com

নাযিল করেছেন তাই এর দুটো পৃথক নামও রয়েছে যা প্রত্যেকেরই জানা এর প্রথমটা হলো "সূরা ফালাক" নামে এবং দ্বিতীয়টি নাম হচ্ছে "সূরা নাস"।

নাযিল হওয়ার সময়কাল ঃ এ সূরা দুটিকে অনেকে বলেছেন মদীনায় নাযিল হয়েছে, অনেকে বলেছেন মক্কায় নাযিল হয়েছে। দুই পক্ষের যুক্তিই খুব জোরাল তবে এর বিষয়বস্তু একথা মানতে বাধ্য করে যে, আসলে এ দুটো সূরা মক্কায় তখনই প্রথম নাযিল হয় যখন রাসূল (স)–এর সাথে কাফের মুশরিকদের বিরোধিতা চরমে পৌঁছেছিল। তখন রাসূল (স) সহ সব ঈমানদার ব্যক্তিগণ নিজেদেরকে চরম অসহায় মনে করছিলেন। তখন আল্লাহ পাক এ দুটি সূরা নাযিল করে রাসূল (স) সহ মুমিনদের বলেন তোমরা এ দুটি সূরা পড়ে আমার নিকট আশ্রয় চাও আমি তোমাদের আশ্রয় দিব। পরে যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন ৭ম হিজরীতে রাসূল (স) এর উপর ইয়াহুদী যাদুকররা যখন যাদু করে তখন পুনরায় এ সূরা দুটির দিকে রাসূল (স)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং বলা হয় এ দুটি সূরা পড়ে যাদুর অনিষ্ট থেকেও আমার নিকট আশ্রয় চাও। আর এটা শুধু এ দুটি সূরার ব্যাপারই নয়, আরো বহু ব্যাপারে হয়ত কোনো আয়াত পূর্বে এক প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল পরে সেই একই জাতীয় সমস্যার উদ্ভব হলে আবার পুনঃ নাযিলকৃত আয়াতকে পুনঃস্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এটাও অর্থাৎ এ দুটি সূরার বেলায়ও তাই হয়েছে।

এ সূরা দুটি নাযিল হওয়ার পূর্বে মুসলমানগণ শত্রুদের ভয়ে সর্বদাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। যে রাতে ঐ সূরা দুটি নাযিল হলো সেই রাতের পরের দিন সকাল বেলা রাসূল (স)–কে হাসিখুশী দেখাচ্ছিল, তখন আনেক সাহাবীই রাসূলের (স) মনের হাসিখুশী ভাব জানার আগ্রহ প্রকাশ করায় রাসূল (স) বললেন, তোমরা কি শুনেছ গত রাতে আমার উপর কি নাযিল হয়েছে, সবাই বললেন বা জিজ্ঞেস করলেন, তখন রাসূল (স) বললেন, তা হল সূরা ফালাক ও সূরা নাস।

কথাটা আরবীতে এভাবে এসেছে —

الم تر انزلك الليلة لم ير مثلهن اعوذ بر ب الفلق

اعوذ برب الناس

www.pathagar.com

অর্থাৎ তুমি কি জান যে, আজকের রাতে আমার নিকট কি ধরণের আয়াত নাযিল হয়েছে, যা ইতিপূর্বে নাযিল হয়নি যা তুলনাহীন। আর তা হচ্ছে আউজু বিরব্বিল ফালাক ও আউজু বিরব্বিন্নাস।

বিয়ষবস্তু ও মূল বক্তব্য —

এর মূল বিষয়বস্তুকে আমরা দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে ও মূল্যায়ন করতে পারি। যথা ঃ

১। আল্লাহর সাথে সব মানুষের একই বিশেষ সম্পর্কের কথা এতে বলা হয়েছে। যা বুঝার অনুভূতি দৃশ্যমান জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই আছে। আর তা হচ্ছে- ১। আল্লাহ সব মানুষের রব, ২। তিনি সব মানুষেরই মালিক, ৩। তিনি সব মানুষেরই ইলাহ।

২। যিনি সব মানুষের রব, সব মানুষেরই মালিক সব মানুষেরই ইলাহ তিনি তাঁর এক গ্রুপ বান্দার জুলুম-অত্যাচার থেকে যদি অন্য এক গ্রুপ বান্দাকে নিষ্কৃতি দেন বা এক গ্রুফ বান্দা যখন আর এক গ্রুপ বান্দাদের কোণঠাসা করে নিরাশ্রয় করে ফেলে তবে সেই কোণঠাসা নিরাশ্রয় গ্রুপের যদি সব মানুষের যিনি রব, মালিক ও ইলাহ তিনি যদি আশ্রয় দেন তাহলে নির্ঘাত তাদের দুর্দিন কেটে গিয়ে সুদিন আসবেই অর্থাৎ জুলুম-অত্যাচারের কালো রাত কেটে গিয়ে সুপ্রভাত আসবেই এবং যে যত তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা বা জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ বা কোনো প্রকার অনিষ্ট ঘটাতে চায় তবে সব মানুষের মূল মালিক তাদের আশ্রয় দিলে কেউই তাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

ঐতিহাসিক যোগসূত্র —

মক্কা শরীফে যখন এ সূরা দুটি নাযিল হয়েছিল তখনকার অবস্থা ছিল এরূপ যে, মুসলমানদের চারদিক থেকে কোণঠাসা করা হচ্ছিল, মুসলমানদের উপর দিয়ে যাচ্ছিল একটা ভয়ংকর নাজুক অবস্থা। রাসূল (স) কি দাওয়াত নিয়ে এসেছে, তিনি কি প্রচার করেছেন এবং তিনি সমাজের মন মানসিকতা, চিন্তাধারা, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কি পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন তা যতই স্পষ্ট হয়ে মক্কার অবিশ্বাসীদের কাছে ভেসে উঠছিল ততই মনে হচ্ছিল যেন হুজুরে পাক (স) (তাফহীমের ভাষায়) ভীমরুলের চাকে ঢিল দিয়ে বসেছেন। আর যায় কোথায়? চারিদিক থেকে ভিমরুলের মত কুরাইশ

www.pathagar.com

কাফেরদের সরদারেরা রাসূলে পাক (স)–এর উপর ভিমরুলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। অর্থাৎ কুরাইশ কাফের সরদারদের জুলুম-অত্যাচার ও শত্রুতায়ী ক্রমান্বয়ে হুজুর (স)–এর উপর চরম থেকে চরম আকার ধারণ করতে লাগল।

হ্যাঁ তবে মাঝে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, অবিশ্বাসী কুরাইশ নেতৃবৃন্দের প্রথম দিকে একটা ধারণা ছিল যে, রাসূল (স)–এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে সম্ভবতঃ একটা আপোষ নিস্পত্তি হতে পারে, তখন তাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ প্রথম দিকে খুবই চেষ্টা করেছিল যে, রাসূল (স)–এর সাথে বিরোধিতায় না গিয়ে দেখা যাক কোনো একটা আপোষ নিস্পত্তি হয় কি না। কিন্তু যখন সমস্ত আপোষ প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল তখন থেকেই তারা চরম শত্রুতায়ীতে লিপ্ত হল। এ সময় রাসূল (স)–এর সাথে কাফেররা দারুণভাবে শত্রুতাই করতে শুরু করে। বিশেষ করে যেসব পরিবারের ছেলে–মেয়েরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাদেরই অভিভাবকরা রাসূলের (স) উপর সর্বাধিক শত্রুতাইত্ব লিপ্ত হয়, কারণ তাদের ছেলেরা ইসলাম গ্রহণ করাই তাদের অভিভাবকদের গায়ে যেন আগুন ধরে যায়। ফলে তারা অতি গোপনে রাতের অন্ধকারে বসে শলা-পরামর্শ করতো যে, রাসূল (স)–কে এমন গোপনভাবে হত্যা করতে হবে, যেন বনী হাসেম গোত্রের কেউ টের না পায় এবং কেউ যেন এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে না পারে এবং কে হত্যা করলো তা যেন কোনো প্রকারেই ফাস না হয় এছাড়া তাদের এত গাত্রদাহ শুরু হয়েছিল যে, রাসূল (স)–কে তারা সবসময় গালিগালাজ করতো। এ গালিগালাজের ধারাটা অবিশ্বাসীদের ঘরে ঘরে চালু হয়ে যায়। এ সময় কিভাবে রাসূল (স)–কে হত্যা করা হবে তার পথ ও পন্থা নিয়ে যখন অতি গোপনে গভীর রাতে মরুভূমির মধ্যে জনপ্রাণী শূন্য স্থানে বসে কয়েকজন কাফেরদের সরদার রাসূল (স)–কে হত্যা করলে বনী হাশেম গোত্রের লোক কোনোভাবে টের পেতে পারে এবং তারা তার প্রতিশোধ নিতে পারে এ ভয়ে রাসূল (স)–কে যাদু করে মারার পরিকল্পনা নেয়। এছাড়াও জ্বিন শয়তান মানুষের বেসে মানুষ রূপি শয়তানদের সাথে মিলে মিশে ইসলাম ও কুরআন–এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে সাধারণ লোকদেরকে ইসলাম, কুরআন ও রাসূলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার কাজ শুরু করে, যার নমুনা আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবী জুড়ে চালু আছে, এমন কি আমাদের এ বাংলাদেশের তের কোটি মুসলমানদের দেশে (ইসলাম কুরআন

www.pathagar.com

ও ইসলাম পন্থীদের মধ্যে) রাসূল (স)–এর যুগের চৌদ্দশত বছর পরেও তা সমানভাবে চালু আছে শুধু তাই নয় রাসূল (স)–এর পূর্বেও অন্যান্য নবীদের যুগেও ইসলাম, নবী–রাসূল ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অপপ্রচার একই কায়দায় চালু ছিল। এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে কারণ এটাই অবিশ্বাসীদের চরিত্র।

পূর্ব জামানায়ও যারা জন্মসূত্রে নিজেদেরকে এক দিকে কোনো না কোনো নবীর উম্মত বলে দাবী করতো অপরদিকে ইসলাম, ইসলামপন্থী ও নবী রাসূলগণের বিরুদ্ধে অপপ্রচারও তারাই করত। প্রসঙ্গতঃ বলতে হয় যে, অবিশ্বাসীদের অপপ্রচারের এ ধরায় যতদিন পৃথিবীতে মানুষ থাকবে ততদিন পর্যন্ত এ ধারা সমানভাবে চালু থাকবে।

এ চিরাচরিত নিয়মানুযাই রাসূল (স)–এর বিরুদ্ধে একদল অবিশ্বাসীদের গাত্রদাহ চরম পর্যায়ে পৌছে বিশেষ করে যাদের পরিবার থেকে ২/১ জন ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারাই বেশী রাসূল (স)–এর বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা বনী হাশেম গোত্রের চোখ এড়িয়ে রাসূল (স)–কে কিভাবে হত্যা করা যায়, এ দূরভিসন্ধিতে মেতে ওঠে। তারা গভীর রাতে বসে শলা–পরামর্শ করে যে, কিভাবে রাসূল (স)–কে হত্যা করা যাবে। অতপর তারা যাদুর দ্বারা হুজুর (স)–কে মারার পরিকল্পনা করে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আবু জেহেল।

এ সংকটপূর্ব সময় রাসূল (স)–কে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, আল্লাহ বলেন ওদের বলে দাও আমি আশ্রয় চাচ্ছি ..... সূরা ফালাক ও সূরা নাসের অনুবাদ দেখুন। অতপর রাসূল (স) বুঝলেন আল্লাহ সব মানুষের রব, মালিক ও ইলাহ্ই যখন আশ্রয় অনেক শিখিয়ে দিলেন। এরপর অন্য মুসলমানরাও তা শুনলো এবং খুশী হলেন। তারা যখন এ দুটো সূরা পড়ে শুনালেন তখন এক দিকে যেমন মুসলমানরা খুশীতে বাগ বাগ হয়ে গেলেন যে খোদ আল্লাহ যখন আমাদের আশ্রয় দেয়ার কথা বলেছেন তখন আমাদের অনিষ্ট করতে পারে এমন কোনো শক্তিই নেই। অপরদিকে যেহেতু এ সূরার মধ্যে তাদের গোপন পরামর্শের কথা আল্লাহ ফাঁস করে দিলেন তখন শত্রুরাও বুঝল যে, আমাদের রাতের শলা–পরামর্শ, যাদুর সিদ্ধান্ত ইত্যাদি আল্লাহ না ফাস করলে কোনো প্রকারেই ফাঁস হতে পারে না, তাই তারা খুবই দুর্বল হয়ে গেল। যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন, আমাকে হত্যা

www.pathagar.com

করার জন্যে একদল লোক গোপনে পরামর্শ করলো, রাতের গভীর অন্ধকারে বসে যা তারা ছাড়া আর কারুরই জানার কথা না। কিন্তু পরদিন সকালেই যদি তাদের সামনে বলে দেই যে, তোমরা গত রাতে অমুক জায়গায় বসে আমাকে হত্যার জন্যে এই এই পরামর্শ করেছো। তাহলে তাদের মারা তো দূরের কথা তাদের হৃদকম্পন শুরু হয়ে যাবে যে, এ খবর এ লোক পেল কি করে।..... তারা আর সাহসই পাবে না কোনো ক্ষতি করতে তদ্রূপ মক্কার বিরোধীরাও এ সূরা শুনে ঘাবড়ে গেল।

অতপর মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পর যখন সত্যি সত্যিই রাসূল (স)–কে বান মারল অর্থাৎ যাদু করলো তখন প্রায় এক বছর পরে রাসূল (স)–এর উপর যাদুর প্রভাব কিছুটা বুঝা যাচ্ছিল।

নবী করীম (স) অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্যে জিবরাইল (আ) এসে রাসূল (স)-কে এ দুটো সূরা পড়ার উপদেশ দিলেন। আর রাসূল (স)–এর সত্যিই যদি যাদুর ক্রিয়া পুরোপুরি কার্যকর হতো তাহলে কাফেররা নবী এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার সুযোগ পেত সূরা বনী ইসরাঈলে ৪৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

"জালেমরা বলতো যে, এই লোকতো এক যাদুগোস্থ ব্যক্তি যার পিছনে তোমরা ছুটছো"।

মক্কার কাফেরদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা চুপি চুপি গোপনে কুরআন শরিফের কথা শুনতো এবং তারপর আপোষে শলা–পরামর্শ করতো এর প্রতিকার কি? কেমন করে এর রোধ করা যায়? বহু সময় তাদের নিজেদের লোকদেরই মধ্যেকার কারো প্রতিও তাদের সন্দেহ হতো যে, সম্ভবতঃ এ ব্যক্তি কুরআন শুনে কিছু প্রভাবিত হয়ে পড়েছে, এজন্য তারা সকলে মিলিত হয়ে তাকে বুঝাতে চেষ্টা করতো যে মিয়া, তুমি কার পাল্লায় পড়ছো? এ লোক তো যাদুগ্রস্থ। অর্থাৎ কেউ এ লোকটিকে যাদু করেছে যার জন্য এ রকম আবোল–তাবোল বকুনি শুরু করেছে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত রাসূল (স) নিজেই বুঝতে পারলেন যে, আমার কি যেন হয়েছে তখন তিনি পরপর আল্লাহর নিকট দোয়া করতে রইলেন অতপর একদিন এক মুহূর্তে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন অথবা তন্দ্রাগ্রস্থ হলেন। তারপর হঠাৎ তিনি জেগে পড়লেন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকাকে বললেন, আমি আমার আল্লাহর কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম আল্লাহ তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত আয়শা সিদ্দিকা (রা)। জিজ্ঞেস করলেন তাকি? নবী করীম (স) বললেন, দুজন লোক

www.pathagar.com

(অর্থাৎ দুজন ফেরেশতা মানুষের বেশে) আমার নিকট আসলো। একজন মাথার দিকে বসলো ও অপরজন পায়ের দিকে বসলো। একজন জিজ্ঞেস করলো এ লোকটার কি হয়েছে? অপরজন বললো এ লোকটার উপর যাদু করা হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করলো কে যাদু করেছে, উত্তরে অপরজন বললো, লবিদ ইবনে আছম । জিজ্ঞেস করলো কিরূপ যাদু করা হয়েছে, জবাবে অপরজন বললো চিরুনি ও চুলে একটি পুরুষ খেজুর গাছের ছড়ায় আবরণের মধ্যে রেখে তাকে যাদু করা হয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো তা কোথায়? জবাবে বললো বনু জুরাইকের যী আরওয়ান কিংবা যারওয়ান নামক কূপের তলায় পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। এখন কি করা যেতে পারে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে বলা হলো, কূপের সব পানিসেচে ফেলে পাথরের নিচ হতে ওটাকে বের করতে হবে, অতপর নবী করীম (স) হযরত আলী, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার ও হযরত জুবাইর (রা)–কে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। জুবাইর ইবনে জুরকি ও কায়েস ইবনে মিহসান জুরকি অর্থাৎ বানু জুরাইকের এ ব্যক্তিদ্বয়ও তাদের সাথে গেলেন পরে নবী করীম (সা) নিজেও কতিপয় সাহাবীদের সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন, কূপ হতে পানি তোলা হলো এবং সেই খেজুর গাছের ছড়ার আবরণ বের করে আনা হলো এবং দেখা গেল চিরুনি ও চুলের সাথে পেচানো একগাছি সুতায় এগারোটি গিরা লাগানো ছিল সেই সাথে একটি মোমের পুতুল এবং এতে কয়েকটি সুচ বিদ্ধ করা ছিল। জিবরাইল (আ) এসে বললেন, মুওয়াওবিজাতাইন বা সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করুন এবং নির্দেশ অনুযায়ী নবী করীম (স) একেকটি আয়াত পাঠ করলেন আর একেকটি গিরা খুলে গেল ও পুতুল হতে একেকটি সুচ বের হয়ে গেল। এবং তিনি সাথে সাথে যাদুর প্রভাব হতে মুক্ত হয়ে গেলেন মনে হলো আটীসাট বাধা এক ব্যক্তি যে হঠাৎই বন্ধন মুক্ত হয়ে গেলে। এরপর নবী করীম (স) লবিদকে ডেকে তার নিকট এ যাদুর জন্যে কৈফিয়ত চাইলেন লবিদ তার নিজের দোষ স্বীকার করলো। রাসূল (স) তাকে মাফ করে দিলেন। কেননা তিনি ব্যক্তিগত কারণে কারো উপর প্রতিশোধ নিতেন না। শুধু তাই নয় এ ঘটনার চর্চা করতেও তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, আল্লাহ যখন আমাকে যাদুর ক্রিয়া হতে মুক্তি দিয়েছেন তখন আমি এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকদের ক্ষ্যাপাতে চাই না।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে রাসূল (স)–এর উপর যাদুর আছর কি করে হতে পারে? যার সহজ সরল জবাব হচ্ছে এই যে, রাসূল (স)–কে মারলে যদি তিনি ব্যাথা পেতে পারেন তবে যাদু করলে তার আছর হবে না কেন, বহু নবী (আ)–কে তো কাফের মুশরিকরা হত্যাও করেছে এবং তাতে তারা শহীদও হয়েছেন। কাজেই রাসূল (স)–এর উপর যাদুর আছর হওয়া কোনো অস্বাভাবিক নয়। হ্যাঁ তবে রাসূল (স)–এর উপর যাদুর আছর হলেও এমন কোনো আছর হয়নি যাতে হুজুর পাক (স)–এর স্বাভাবিক নবীসূলভ জ্ঞানবুদ্ধির উপর কোনো আছর পড়ে। এমন কিছু হয়নি। তাছাড়া আল-কুরআনে রয়েছে হযরত মূসা (আ)–এর বিরুদ্ধে ফেরাউনের যাদুকররা যখন রশি ফেলে তাকে সাপের মত দেখানোর যাদু বা নজরবন্দি যাকে আমরা বলি তাও তো একজন নবীর (স) উপর কার্যকর হয়েছিল।

এ ছাড়াও রাসূল (স) নিজেই বলেছেন কুরআনের ভাষায় আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, শুধু পার্থক্য এই যে, আমার উপর অহি নাযিল হয়। (সূরা কাহাফের শেষ আয়াত দেখুন)।

তাছাড়াও ইসলামও কোনো অবাস্তব ধর্ম নয়–এর যেখানেই মানুষ নজর করবে সেখানেই দেখবে যে ইসলাম কোনো ঝাড় ফুঁক বা দোয়া তাবিজ সর্বস্ব কোনো ধর্ম নয় তা যদি হতো তাহলে রাসূল (স)–কে দাঁত ভাঙ্গা লাগতো না, হিজরাত করা লাগত না, এমন কি কোনো যুদ্ধও করা লাগত না। তবে যাদু বলে যেহেতু একটা কিছু আছে যা দিয়ে মানুষের ক্ষতি করা যায় তা দেখান এবং তার হাত থেকে বাঁচার জন্যেই আল্লাহ রাসূল (স)–এর জীবনীতেও এমন একটা ঘটনা ঘটালেন যার থেকে আমরাও জানতে পারলাম যে একান্তই কেউ যদি কাউকে যাদু করে তবে তার হাত থেকে বাঁচার জন্যেও আল্লাহ কুরআনে এ সূরা দুটি নাযিল করছেন।

মানুষের উপর যে যত বড়ই যাদু টোনা করুক না কেন, এ সূরা দুটো পড়ে ঝাড় ফুঁক করে তার চিকিৎসা করা যায়। আমার নিজের জীবনেও আমি কয়েক ক্ষেত্রে এটা পরীক্ষা করেছি। যেমন প্রথম পরীক্ষা করলাম। এক খুনি কেসের সাক্ষীকে খুনি কেসের আসামীরা বহু অনুরোধ করলো যে, তাদের বিরুদ্ধে যেন হক কথা না বলে। কিন্তু কোনো প্রকারেই সাক্ষীকে রাজী করতে না পেরে তাকে এমন যাদু করেছিল যে, তার রক্তবমি শুরু হয়ে যায়। আমি খবর শুনে বিনা ডাকে সেখানে উপস্থিত হয়ে এ দুটো সূরা পড়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করলাম যে, আল্লাহ তোমার এ কালামের অছিলায় লোকটাকে ভাল করে দাও। পরে এ সূরা দুটো পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে তাকে খাইয়ে দেয়ার পরই সে লোক আল্লাহর দয়ায় সুস্থ হয়ে উঠল।

www.pathagar.com

দেখেছি আমাদের যৌবনকালে পাড়া গায়ে একটা উৎপাত ছিল, তা হচ্ছে এক শ্রেণীর ফকীর যারা তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যবসা করত তারা ছোট বাচ্চা ছেলে-মেয়ের মাথার চুল কেটে নিয়ে অপরের ছেলেকে কি মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে তাবিজ করে দিতো, এতে যার মাথার চুল কেটে নিয়ে এরূপ করত তাদের সেসব চুলকাটা ছেলে-মেয়েরা ক্রমান্বয়ে অসুস্থ্য হয়ে পড়তো। আমার নিজের সন্তানের বেলায়ও মানুষ এরূপ করেছে। আমাকে আল্লাহ যে কয়টি সন্তান দিয়েছেন তারা সংখ্যায় ১০ জন (একটা ছেলে ৫/৭ দিন বয়সে মারা যায় সেটা বাদ) আমার ছেলে মেয়েদের এ দুটি সূরা দিয়েই আমি চিকিৎসা করেছি। আল্লাহর মেহেরবাণীতে কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। তবে একথা ঠিক যে, কুরআন কোনো ঝাড়-ফুঁকের জন্যে নাযিল হয়নি। তবুও ঝাড়-ফুঁকে কাজ হয়। এটার উদাহরণ এরূপ দেয়া যায় যে, ধরুন একটা এমন ঔষধ তৈরী করা হলো যার রং সম্পূর্ণ লাল হয়ে গেল। ওটা প্রকৃতপক্ষে তৈরী হয়েছে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে কিন্তু তা দিয়ে অতিরিক্ত কাজও করা যায়, তা হচ্ছে ঐ ঔষধের মধ্যে একখানা সাদা রুমাল চুবিয়ে দিলে রুমালটি একেবারে পাক্কা লাল রং-এর হয়ে যায়। তাই বলে বলা যাবে না যে, ঐ ঔষধ কাপড় রঙ্গানোর জন্য একটা রং বা ওটাকে কাপড় রংগানোর জন্যে তৈরী করা হয়েছে। তবে তার দ্বারা বাড়তী কাজও হয়। ঠিক তেমনই কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানবজাতির জীবন বিধান হিসাবে। কিন্তু তার থেকে বাড়তি ফায়দাও নেয়া যায়। তাই বলে বলা যাবে না যে, আল-কুরআন একখানা বৃহৎ তাবিজের কিতাব।

ইসলামের ঝাড়-ফুঁকের স্থান

এতক্ষণের আলোচনায় অব্যশই মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে —

১। তা হলে ঝাড়-ফুঁকের দ্বারা কি আসলেই কোনো কাজ হয়?

২। ঝাড় ফুঁক করে টাকা উপার্জন করা কি জায়েয?

৩। ইসলামী পন্থায় যাদু করলে যাদুর দ্বারা যে কাজ হয় এ যাদু শক্তি পায় কার কাছ থেকে? যাদুর শক্তির উৎস কি ?

৪। আল্লাহর রাসূলের উপর কি করে যাদুর আছর পড়ে?

এসব প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব আসা দরকার। কিন্তু শেষ দুটো প্রশ্ন এতই জটিল বলে মনে হবে যে, মানুষ মনে করে নিতে পারে যে, আল্লাহর শক্তির বাইরেও কোনো অলৌকিক শক্তি আছে? যদি থেকে থাকে তবে তা কি? এবার এক এক করে প্রশ্নগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা করি। যথা —

www.pathagar.com

১নং প্রশ্নের জবাব

ঝাড়-ফুঁকের দ্বারা তো কাজ হলোই। রাসূল (স)-এর উপর যখন যাদু করেছিল সে যাদু তো সূরা ফালাক ও সূরা নাস দ্বারা চিকিৎসা করলেনই তা ছাড়াও এ দুটি সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূল (স) যখন নিজের মধ্যে যে কোনো ব্যাপারে অস্বত্বিবোধ করতেন তখন এ সূরা দুটি পড়ে দুই হাতের তালুতে ফুঁক দিতেন এবং দুই হাত দিয়ে শরীরের যতটুক সম্ভব মলে দিতেন। এ ঘটনাটি খোদ আয়শা (রা) বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এটা সহীহ সনদ সূত্রে বর্ণিত। এর দ্বারা বুঝা যায় অর্থাৎ কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামে ঝাড়-ফুঁক এর কার্যকারিতা আছে। এ ছাড়া কুরআন মজিদেও সূরা ইয়াসিনে বলা হয়েছে যে, এর মধ্যে রোগ মুক্তিও রয়েছে, তবে এর অর্থ এ নয় যে, কুরআন একটি বৃহৎ তাবিজের কিতাব। রোগ মুক্তিও রয়েছে এর অর্থ এ হতে পারে যে, কুরআন মজিদে একথা বলা হয়েছে কিসের মাধ্যমে রোগ মুক্তি হতে পারে যেমন মধু সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন "ফিহি শিফাউললিননাস" অর্থাৎ মধুর মধ্যে মানুষের জন্যে রোগ মুক্তি রয়েছে। শুধু এতটুকু কথার দ্বারাই দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে —

১। কুরআন শরিফের আয়াত দ্বারা ঝাড় ফুঁক করলে তাতেও রোগ মুক্তি হতে পারে।

২। আল্লাহর দেয়া কোনো নেয়ামতের মাধ্যমে রোগ মুক্তি হতে পারে সেটাও কুরআনে বলা হয়েছে।

তবে একথা বারংবার বলে দিতে চাই যে, কুরআন রোগ মুক্তির জন্যে নাযিল হয়নি, কুরআন নাযিল হয়েছে মানুষের জীবন বিধান হিসাবে। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, বায়ুর সৃষ্টি প্লেন চলার জন্যে নয় বরং প্লেন আবিষ্কারের বহু পূর্ব হতেই বায়ুর বিশেষ কার্যকারিতা রয়েছে কিন্তু বায়ু এমন এক পদার্থ যার মূল কার্যকারিতা ছাড়াও আরো বহু গুনাগুণ আছে যার মধ্যে প্লেনকে উড়াবার শক্তিও আছে যদিও প্লেনকে উড়াবার জন্যেই বায়ুকে সৃষ্টি করা হয়নি। ঠিক তদ্রূপই কুরআনকে নাযিল করা হয়েছে মানুষের জীবন বিধান হিসাবে কিন্তু যেহেতু কুরআন আল্লাহর কালাম কাজেই আল্লাহর অসীম কুদরতে আল্লাহর কালামে অতিরিক্ত ফায়দা হিসাবে ঝাড়-ফুঁকের কাজও করা যায় তাই বলে কেউ ইচ্ছা করলেই আল্লাহর কালাম দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতে পারে না।

www.pathagar.com

২নং প্রশ্নের জবাব

আল্লাহর কালাম অর্থ উপার্জনের জন্যে কোনো মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা কোনো প্রকারেই যেতে পারে না আর যদি তা করা হয় তবে কুরআন আর জীবন বিধান থাকবে না কুরআন হয়ে পড়বে সাধারণ মানুষের নিকট বৃহৎ তাবিজের কিতাব এবং সাথে সাথে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধারণা হয়ে পড়বে সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

৩নং প্রশ্নের জবাব

এই যে, শয়তানকে আল্লাহ যে শক্তি দিয়েছেন তা শয়তানের উপর খুশি হয়ে নয় বরং তার বান্দাদের পরীক্ষার জন্যেই শয়তানকে আল্লাহ এটা দিয়েছেন কিন্তু মানুষকে আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছেন সেই জ্ঞান দ্বারা শয়তানের সব শক্তিকে মানুষ পরাস্ত করতে পারে। আল্লাহ দেখতে চান যে, মানুষ আল্লাহর দেয়া জ্ঞানকে কাজে লাগায় কিনা। সহজ কথায় বুঝুন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশী করতে পারে আল্লাহ অব্যশই তার ডাক শোনেন যদি তা আল্লাহর বিধানের বাইরে না হয়। আর শয়তানকে যে রাজী খুশী করতে পারবে শয়তানও তার কথা শুনবে যদি তার শক্তির বাইরে না হয় আসলে মন্ত্র-তন্ত্র যাদু–টোনার কোনো শক্তি নেই। শক্তি একটা আছে শয়তানের যা মুসলমানদের পূর্ব থেকেই জানা আছে। মন্ত্র পড়লে শয়তান তার শক্তিকে প্রয়োগ করে মন্ত্র পাঠকারী যা চায় শয়তান তার উপর সেই প্রভাব খাটায়।

শেষ প্রশ্নের জবাব

যাদু যেমন একটা শয়তানী শক্তি যা আল্লাহ শয়তানকে দিয়েছেন তেমন কাফের মুশরিকদের গায়ে যে শক্তি তাও আল্লাহর দেয়া শক্তি। আল্লাহর দেয়া শক্তি দিয়ে যখন তারা আল্লাহর নবীগণকে আঘাত করেছে সে আঘাতে যদি নবী–রাসূলগণ ব্যাথা পেতে পারেন এবং তাদের আঘাতে কত শত শত নবী শাহাদাতও বরণ করেছেন। দেখুন মুসা (আ)–এর পরে বনি ইসরাঈলের অবাধ্য লোকেরা কত নবীকে হত্যা করেছে। পড়ুন বিভিন্ন তাফসীর থেকে। এ ছাড়া আল-কুরআনের স্পষ্ট ভাষা হচ্ছে ইয়াকতুলুনান্নাবিইনা।

(يقتلون النبيين.....)

www.pathagar.com

অর্থাৎ তারা বহু নবীকে হত্যা করেছে। এখন চিন্তা করুন কাফের মুশরিকদের দেয়া আল্লাহর শক্তি নিয়ে যদি তারা নবীদের পর্যন্ত হত্যা করতে পারে আর তাতে যদি আল্লাহর নবীগণ নিহত হতে পারেন তবে রাসূল (স) তো মানুষ তিনি কাফেরের হাতে মার খেয়ে যদি ব্যাথা পেতে পারেন, তবে যাদুর শয়তানী শক্তির প্রভাব তার উপর কেন পড়বে না। অব্যশই পড়ে এবং এটা যুক্তি বিরোধী কোনো কথা নয়।

রাসূল (স)–এর উপর যাদুর ইতিহাস

রাসূল (স)–কে কখন যাদু করা হয়েছিল। জনমনে প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে এজন্যে এ ইতিহাসটাও মানুষের নিকট পরিষ্কার থাকা দরকার। তাই সংক্ষিপ্তকারে নিম্নে ইতিহাসটা তুলে ধরা হলো।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসূল (স) যখন তার সঙ্গি সাথীদের নিয়ে মদীনায় ফিরে যান। তখন ৭ম শতাব্দীর মহররম মাসে খাইবার থেকে এক দল ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি মদীনায় এসে হাজির হলো এবং লবিদ ইবনে আসম নামক একজন ইহুদী যাদুকরের কাছে এসে হাজির হলো। লবিদ ইবনে আসম ইহুদী গোত্রভুক্ত ছিল বলে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য তাফসিরে উল্লেখ রয়েছে। লাবিদ ইবনে আসম ছিল বনু যুরাইক বংশের লোক অথবা বনু যুরাইক গোত্রের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তবে এ ব্যাপারে অধিকাংশ লোক এ মত প্রকাশ করেছেন যে, লবিদ ইহুদীদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল এবং সে একজন বড় যাদুকর ছিল। খাইবার থেকে আসা ইহুদী প্রতিনিধি দল লবিদ কে বললো যে, হযরত মুহাম্মদ (স) আমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন তা তো তোমরা জানই কাজেই আমরা তাকে যাদু করার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি, এখন তোমার নিকট এসেছি তোমার দ্বারাই রাসূল (স)–কে যাদু করানোর জন্য। কারণ জানি যে তুমি সবচেয়ে বড় যাদুকর এবং তোমার যাদুতে অব্যশই আসর পড়বে। কারো কারো মতে লবিদের বোন ছিল বড় যাদুকর। অতপর লবিদ এ ইহুদি প্রতিনিধি দলকে বলল রাসূলের মাথা আচড়ানোর একটি চিরুনি এবং তার মাথার চুল পেলে আমি অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করে তাকে যাদু করতে পারি। তখন রাসূল (স)-এর একজন খাদেম ইহুদী নওমুসলিমকে ঐ প্রতারক ইহুদীরা অনুরোধ করে রাসূল (স)–এর মাথা আচড়ানো একটা চিরুনি দিতে। সে রাসূল

www.pathagar.com

(স)–এর মাথার একটি চিরুনি তাদেরকে দিল। সে নওমুসলিম হলেও নিজের স্বগোত্রের লোকদের প্রতি মনের দিক দিয়ে সম্ভবত কিছুটা সহানুভূতি ছিল।

নইলে সে নিশ্চই রাসূলের (স) মাথা আচড়ানো চিরুনি তাদের দিয়ে দিতে পারত না। সে যে চিরুনি দিয়ে ছিল তাতে রাসূলের (স) মাথার চুলও ছিল। সে চুলও যাদুর জন্য প্রয়োজন ছিল। সেই চিরুনি ও চুল নিয়ে কিভাবে যাদু করে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। পুরুষ খেজুর গাছের একটি আবরণের মধ্যে জড়িয়ে যাদু করা হয় এবং তা যারওয়ান অথবা যি আরওয়ান। যা পূর্বেই বলা হয়েছে। পুরুষ খেজুর গাছের ছড়ায় একটি গন্ধ কিছুটা মানুষের শূক্রের গন্ধের সাথে মিল রয়েছে। এ জন্যই সম্ভবত পুরুষ খেজুর ছড়ার আবরণ যাদুর জন্য নেয়া হয়েছিল। একথাও কথিত আছে যে, খেজুর গাছের সাথে নাকি মানুষের একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে।

সে সম্পর্কটি হচ্ছে এই যে, পৃথিবী থেকে যে মাটি নিয়ে হযরত আদম (আ)–কে তৈরি করা হয় ঐ মাটির কিছুটা অবশিষ্ট থেকে যায় এবং সেই অবশিষ্ট মাটি দিয়েই খেজুর গাছ তৈরি করে তা পৃথিবীর মাটিতে (আরব দেশে বা আরব দেশ যেখানে অবস্থিত) রোপন করা হয় এজন্য যদিও খেজুর গাছ মানুষ নয়, তবুও যেহেতু আদম (আ)–কে তৈরি করার পর বাড়তি মাটি দ্বারা খেজুর গাছ তৈরি করা হয়েছিল তাই এ খেজুর গাছকে মানবজাতির ফুফুও বলা হয়। অতপর রাসূল (স)–কে যাদু করার প্রায় এক বছর পর তার উপর যাদুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এরপর রাসূল (স) যখন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং কোনো কাজ করেছেন কি করেনি এটা যখন ভুল হতে দেখা যায় তখন তিনি নিজেও বুঝতে পারেন যে কি যেন আমার হয়েছে ঠিক এ সময় যখন তিনি মনে মনে আল্লাহর নিকট জানতে চেয়েছিলেন যে আমার কি হলো। তখন আল্লাহ স্বপ্নের অথবা তন্দ্রার মাধ্যমে রাসূল (স)–কে দুজন ফেরেশতার মাধ্যমে তা জানিয়ে দেন। এটাই হলো রাসূল (স)–কে যাদু করার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

www.pathagar.com

এ দুটো সূরা কি আসলেই কুরআনের অংশ?

আলোচ্য সূরা দুটির বিষয়ের মূল বক্তব্য বুঝার জন্য কিছু অতিরিক্ত আলোচনা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে প্রথম প্রশ্ন করা হয়েছে যে, সূরা দুটি কি আসলেই নিসন্দেহে ও অকাট্যভাবে কুরআনের সূরা বলে প্রমাণিত? নাকি এব্যাপারে কিছু মাত্র সন্দেহের অবকাশ আছে। এ রূপ প্রশ্ন ওঠার বড় কারণ এই যে, রাসূল (স)-এর একজন উচ্চ মর্যাদার সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)–এ সূরা দুটিকে কুরআনের সূরা হিসাবে মানতেন না। তার নিকট যে মাসহাব রক্ষিত আছে তা থেকে তিনি এ সূরা দু'টিকে খারিজ করে দিয়েছেন। একথা

এ উক্তিটির পিছনে বহু নির্ভরযোগ্য সনদ রয়েছে। এসব বর্ণনায় যেমন তিনি সূরা দুটিকে তার মাসহাব হতে খারিজ করে দিয়েছেন। তেমনিও সেই সাথে একথাও বলেছেন যে, তিনি নাকি প্রায়ই বলতেন যাহা কুরআনের অংশ নয়, তা কুরআনের সাথে যুক্ত করো না। এ সূরা দুটি কুরআনের মধ্যে শামিল নয়। এতো আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)–এর প্রতি একটি হুকুম দিয়েছেন মাত্র। যার মাধ্যমে তিনি রাসূল (স)–কে আশ্রয় চাইতে বলেছেন। তিনি এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছেন। এবং তাঁর সঙ্গি সাথি সাহাবীগণ তাঁরাও এর মাধ্যমে আশ্রয় চাইলেন। কাজেই এটা আশ্রয় চাওয়ার একটা নির্দেশ মাত্র। এমনকি সনদ সূত্রে একথাও বর্ণিত আছে যে তিনি (হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এ সূরা দুটিকে নামাযের মধ্যে পড়েননি। এতে ইসলামের শত্রুদের পক্ষে কুরআনের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টির একটা সুযোগ লাভ সম্ভব পর হয়েছে। তাঁরা বলার সুযোগ পেয়েছিল যে, কুরআন বোধ হয় বিক্রিত ও রদ বদলের হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত নয়। বিশেষ করে হযরত ইবনে মাসউদ (রা)–এর মুখ দিয়ে যখন এরূপ উক্তি বের হয় তখন বিরুদ্ধবাদীরা বলতে লাগল একজন প্রভাবশালী সাহাবীর মুখ দিয়ে যখন একথা বের হয়েছে তখন কুরআনের আরো অনেক কথা বাইরে থেকে এনে কুরআনের সাথে হয়তোবা জুড়ে দেয়া হতেও পারে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)–এর এ উক্তির কারণে ইসলামের শত্রুরা কুরআনের উপরে একটা বড় ধরনের আক্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আসলে ঠিক নয়। অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁরা এর ব্যাখ্যা এরূপ দিয়েছেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) শুধু এতটুকু কথাই বলেছিলেন যে, যা আল্লাহর রাসূল কুরআনে শামিল করতে হুকুম দেননি, তা কি করে কুরআনের মধ্যে শামিল করা যায়।

www.pathagar.com

আর এটা যে, সত্যিই আল্লাহর রাসূল কুরআনের শামিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হযরত ইবনে মাসউদ (রা) নিজের কানে শোনেননি। এ ছাড়া হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তিনি কখনও কুরআনের কোনো অংশকে একবিন্দু পরিমাণও অস্বীকার করেননি। এটা শুধুমাত্র না শুনার কারণেই হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সূরা দুটি কুরআনেরই অংশ এবং রাসূল (স) নিজেই এ সূরা দুটি নামাযে পড়েছেন এবং অন্যান্য সাহাবীগণও এ সূরা দুটিকে নামাযের মধ্যে বেশি বেশি করে পড়তেন। এমনকি এমনও রেওয়ায়েত আছে যে, একজন ইমাম সাহেব ফজরের নামাযের ওয়াক্তেও এই ছোট সূরা দুটি পড়ে নামায আদায় করেছেন এতে মুসল্লিগণ ইমাম সাহেবকে ধরে রাসূল (স)-এর দরবারে হাজির করেন এবং ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে বলেন যে, তিনি ফজরের নামায এত ছোট সূরা দিয়ে আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি কি সত্যি এরূপ করেছেন? তিনি জবাবে বললেন আমি এরূপ করেছি অতপর রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন আপনি এত ছোট সূরা দিয়ে কেন ফজরের নামায আদায় করলেন। তার জবাবে ইমাম সাহেব বললেন ঃ হুজুর এ সূরা দুটির ফযিলত যেভাবে আপনি বর্ণনা করেছেন, তাতে এ সূরা দুটিকে আমি অত্যন্ত মহব্বত করি এবং এ সূরা নামাযে পড়লে আমার মনে খুব ভাল লাগে। এ ধরনের জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আপনি একজন বেহেশতি লোক। এতে অন্যান্যরা চুপ হয়ে গেল। তাই বলে একথা কেউ ধারণা করবেন না যে, ছোট সূরা দিয়ে রসূলুলুল্লাহ (স) ফজরের নামায আদায় করার নির্দেশ দিলেন। এখানে শুধুমাত্র আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার দুটি সূরার প্রতি মনের একান্ত টান ও মহব্বত থাকা যে বেহেশতি লোকের লক্ষণ তাই মাত্র রাসূল (স) কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এ সূরা দুটি কুরআনের অংশ নয় এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে কোনো প্রকার খারাপ ধারণা পোষণ করার বিন্দুমাত্র যুক্তি নাই। তিনি যা বলেছেন তা নেক নিয়েতেই বলেছেন আর তিনি রাসূল (স)-এর এ কথাটি শুনে ছিলেন না যে তিনি সূরা দুটিকে কুরআন শামিল করতে বলেছেন। কারণ, রাসূল (স) পূর্ব থেকেই বলে রেখেছিলেন, যে কথাকে আমি কুরআনের কথা হিসাবে বলব তোমরা মাত্র সেটুকুকেই কুরআনের সাথে যুক্ত করবে। রাসূলের (স) প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই রাসূলের (স) কথা বা নির্দেশ নিজে না শোনার কারণেই এরূপ বলেছিলেন। ব্যাস, এ ব্যাপারে এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট। তবে আমি নিজেও যখন

www.pathagar.com

কোনো প্রকার বিপদাপদ বা মুশকিল মুসিবতে পড়ি কিংবা বড় ধরনের রোগ ব্যাধিতে ভুগি তখন আমি নিজেও এ সুরা দুটি বেশি করে পড়ি। এমন কি অনেক সময় পানি পান করতে গিয়েও এ সূরা দু'টি পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করি। এতে মনেও যেমন তৃপ্তি পাই তেমন দেহেও আরাম পাই। আমি দেখেছি আমার মাদ্রাসা জীবনের এক হুজুর পান খাওয়ার সময়ও কি যেন পড়ে পানে ফুঁক দিয়ে পান মুখে দিতেন। আমি একদিন এরূপ করতে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম হুজুর আপনি কি পড়ে পানে ফুঁক দেন। তিনি বললেন, আমি সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে পানে ফুঁক দেই। শুধু পানে নয় আমি যা-ই খাই তাই এরূপ করে খাই। এতে কোন খাদ্যেই আমার কোনো ক্ষতি করে না এবং এ বয়স পর্যন্ত প্রায় যুবকের মতই রয়েছি আর সত্যিই তাঁর চেহারা দেখে কেহই তাঁর প্রকৃত বয়স আঁচ করতে পারতো না। এরপর থেকে আমিও তা আমল করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনা, প্রায় সময়ই ভুলে যাই আর যখন ভুলিনা তখন ওর ওপর আমল করতে আমার নিকট সত্যিই ভাল লাগে। এবং আমার যতদূর মনে পড়ে এই সূরা দুটির মূল তাৎপর্য জানার পর থেকে আমার মনে হয় এ সূরা দুটি আমার যতবার পড়া হয়েছে আর কোনো সূরাই হয়ত বা এর চেয়ে অধিক বার পড়া হয়নি।

এটা যদিও আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তবুও বললাম এ জন্যে যে, এ বইটি তো বেশির ভাগ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাই বোনেরাই বেশি পড়বেন। তাই তাদের উপর ঐ অবস্থা এসেই রয়েছে যে, অবস্থায় রাসূল (স)–এর উপর এ সূরা নাযিল হয়েছিল। কাজেই তাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই এটার উপর আমল করবেন। এ আশা নিয়েই কথাগুলো বললাম নইলে আমার ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার আমি কি আমল পসন্দ করি তা বলার কোনোই দরকার ছিল না.....।

এ সূরা দুটির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সাথে মানুষের বিশেষ সম্পর্কের কথা

লক্ষণীয় যে, এর একটি সূরার নামের বাংলা অনুবাদ করলে নাম দাঁড়াবে 'মানুষ' মানুষের আরবী হচ্ছে 'নাস' কাজেই বলতে হবে সূরা নাসকে আমরা বাংলাদেশের মানুষ শুধু এতটুকুই জানি যে এটা 'নাস' নামের একটি সূরা কিন্তু জানিনা যে এটা 'মানুষ নামের একটি সূরা। আমি বহু ওয়াজ বা তাফসীর মাহ্ফিলে গিয়ে ওয়াজের মাঝে শ্রোতাগণকে জিজ্ঞেস করেছি যে,

www.pathagar.com

আপনারা কি জানেন যে আল কুরআনের ১১৪টি সূরার মধ্যে মানুষ নামের একটি সূরা আছে এবং তার মধ্যে মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে? জিজ্ঞেস করে বলেছি যারা জানেন না যে, আল কুরআনে মানুষ নামের একটি সূরা আছে এবং তার মধ্যে মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে তারা একটি হাত উঁচু করে দেখান, আমি একটু বুঝি যে কি পরিমাণ লোক এটা জানে না। এরপর দেখছি একেবারে ঢালাবাবে হাত-উঠে গেছে। যারা হাত তুলেছেন- বলতে লজ্জা নেই যে এমনও লোক হাত তুলেছেন যাদের আদৌ হাত তোলার কথা নয় তারাও হাত তুলেছেন যে, সমাজ ব্যবস্থা আমাদের কোথায় নিয়ে গেছে। কোনো লাইসেন্সধারী গাড়ীর ড্রাইভার যিনি লাইসেন্স অর্জন করেছেন কিন্তু গাড়ী চালাননি- তিনি যদি বলেন যে গাড়ীর গিয়ার কোনোটা তা আমি জানি না তবে সে ড্রাইভারের লাইসেন্স যেমন শুধু লাইসেন্সই এবং ওটা লোকদের দেখানোর জন্যেই ওর আর কোনো মূল্য নেই। ঠিক তেমনিভাবে আমাকে নিরাশ হয়ে ভাবতে হয়েছে যে, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কুরআনি আইনের কোনো বাস্তব ব্যবহার না থাকায় আমাদের মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সার্টিফিকেট ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত সমাজরূপী গাড়ীর ড্রাইভারে ভূমিকায় কাজ করার লোকগুলোরও অধিকাংশই ড্রাইভারী লাইসেন্স পেয়েছি কিন্তু গিয়ার চিনি না। আর চিনবই বা কি করে? কারণ গাড়ী চালানোর জন্য যে ড্রাইভারী শিখেছি তাও তো সমাজ আমাদের জানতে দেয়নি সমাজ বলেছে ড্রাইভারী শিখলে বেহেশতে যাওয়া যাবে। তাই বেহেশতে যাওয়ার জন্যে ড্রাইভারী শিখেছি- গাড়ী চালনার জন্যে নয়। কাজেই গিয়ার চিনবার আমাদের তো কোনো দরকার নেই।

মাফ করবেন মনের দুঃখেই এ কথাগুলো বললাম। বললাম এজন্যে যে, আমাদের মধ্যে যেন একটা অনুভূতি জাগ্রত হয়, যে কি ছিল আমাদের বাস্তব কাজ, আর কিভাবে তার থেকে আমরা দুরে রয়েছি। এ অনুভূতি জাগ্রত করার উদ্যেশ্যেই আমি এ মানুষ নামের সূরার শুধুমাত্র رَبِّ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ ও مَلِكِ النَّاسِ – এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনখানা ছোট বই লিখেছি যার নাম হচ্ছে যথাক্রমে (১) রব হিসাবে আল্লাহর পরিচয়। (২) মালিক হিসাবে আল্লাহর পরিচয় (৩) ইলাহ হিসাবে আল্লাহর পরিচয়। আল্লাহর মেহেরবাণীতে যদি বই ৩খানা কখনও হাতে পড়ে তবে তা পড়ে

www.pathagar.com

দেখার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রইল। কারণ একবার যা লেখা হয়ে গেছে তা পূণর্বার লেখা শোভা পায় না। তাই এ সূরার মধ্যে পুরা ব্যাখ্যা দেব না তবে এটা যেহেতু একটা মূল সূরার দারস কাজেই কিছু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিতেই হবে তাই দিচ্ছি।

এ মানুষ নামক সূরার মধ্যেই আল্লাহ বলেছেন, তিনি সব মানুষেরই রব। হযরত মূসা (আ) রাসূল (স)-এর অবস্থায় পড়লে আল্লাহ মূসা (আ)-কে এ ধরনের কথায় আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে শিখিয়ে দিয়েছিলেন-যা পাবেন সূরা দুখানের ২০নং আয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে —

وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنَ

আর তোমরা আমার উপর আক্রমণ করবে, আমি তা আশ্রয় নিয়েছি সেই রবের কাছে যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব।

আর ফেরাউন যখন তার জনাকীর্ণ দরবারে ঘোষণা দিয়েছিল যে, আমি মুসা (আ)-কে হত্যা করব। তখনও সে এ ধরনের ভাষাতেই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিল —

اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ-

"আমি আমার ও তোমাদের রবের নিকট আশ্রয় নিয়েছি পরকালের হিসাব নিকাশের প্রতি অবিশ্বাসী সব অহংকারী দাম্ভিক হতে।"

— সূরা মুমিন- ২৭ আয়াত

এর থেকেও যেমন স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ সব মানুষেরই রব তেমন আরো পরিষ্কার হয়েছে সূরা আল-আ'রাফের ১৭২নং আয়াত থেকে যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ সব রূহকে সৃষ্টি করে সবাইকে এক সাথে জিজ্ঞেস করেছিলেন اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের রব নই ? তখন আমরা সব রূহ এক সাথে বলেছিলাম قَالُوْا بَلٰى তারা বললো, হ্যাঁ (আপনি আমাদের রব)।

www.pathagar.com

এর থেকে বুঝা গেল আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক হলো আল্লাহ আমাদের রব। আর আমরা আল্লাহর দাস, আমরা আল্লাহর হুকুম পালনকারী বা আজ্ঞাবহ গোলাম মাত্র। তিনি আমাদের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং জ্ঞান দান করেছেন এবং জ্ঞান, বুদ্ধি বিচার বিবেচনা সম্পন্ন ও ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পন্ন একটা জাতি হিসাবে। তিনি হুকুম করবেন আর আমরা বিবেক বুদ্ধি সহকারে নিজের ইচ্ছা শক্তিতে জেনে বুঝে স্বাধীনভাবে তার হুকুম মেনে চলবো। এটাই আমাদের দায়িত্ব। এর মধ্যে কি ও কেন প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই। আর যদি বুঝি যে, আল্লাহর হুকুম মানতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না তাহলে তখনই বুঝব যে, শয়তান আমাকে বিভিন্ন কায়দায় ওয়াস ওয়াসা দিয়ে আমার ইচ্ছা শক্তিকে বিপথগামী করতে সক্ষম হয়েছে। তখনই আমাকে বলতে হবে —

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ-

অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি। এরপর সাথে সাথে মনকে রাজী করে ফেলতে হবে যে, আমি আমার রবের হুকুম মানবই তাতে যদি আমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হয় তবুও। আল কুরআনের অন্যত্রও এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন শয়তানের ওয়াস ওয়াসায় পড়ে আল্লাহ বিরোধী কাজকে পসন্দ করে বসে তখন তাকে বুঝতে হবে, শয়তানের ওয়াস ওয়াসায় আমি বিভ্রান্ত হয়েছি। তখন তাকে নিম্নের আয়াত পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে —

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ

বল হে আমার রব আমি শয়তানগুলোর উত্তেজনা ও উস্কানী হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ যে আমাদের নিকট থেকে দুনিয়ায় আসার পূর্বেই رَبّ এর স্বীকৃতি নিয়েছিলেন সেই স্বীকৃতি মুতাবিক আল্লাহ আমাদের রব। কাজেই মানুষের সাথে তাঁর নিজের সম্পর্কের কথা যতবার আল্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন ততবারই রব শব্দ দিয়ে তা ব্যবহার করেছেন।

www.pathagar.com

রব্বানা বলে কেন মুনাজাত শুরু করি

আমরা কেউ মায়ের নিকট ভাত চাইলে বলি মা আমাকে ভাত দিন। দুনিয়ার কেউই মাকে বলে না, যে ওগো আমাকে ভাত দিন মাকে মা বলে ডাক দিয়ে ভাত চাইলে মা বুঝেন যে, আমি যেহেতু ওর মা, কাজেই ভাত তো আমার কাছেই চাইবে। আমার ছেলেমেয়ে আমার নিকট ছাড়া আর কার কাছে ভাত চাইবে আর কেই বা আমার ছেলেমেয়েকে খেতে দিবে। ও দেয়াটাতো আমাকেই দিতে হবে। কাজেই মায়ের নিকট যা কিছুই চাই না কেন প্রথমে মাকে মা বলে একটা ডাক দেয়ার পরই তা চাই তদ্রূপ বলি আব্বা আমাকে ১০টা টাকা দিন। যখনই আব্বাকে আব্বা বলে ডাক দিয়ে তার সন্তান কিছু চায় তখন আব্বাও বুঝেন যে, আমি যখন আব্বা তখন আমার ছেলেমেয়েরা আমার কাছে চাইবে, না তো আর কার কাছে চাইবে, আমি ছাড়া। সে চাইবেও আমার কাছে এবং যা চাইবে তা দিতেও হবে আমাকেই। এমনকি আমি যখন কোনো দূরপাল্লার ট্রেনে বা বাসে বিভিন্ন দূর এলাকায় সফর করেছি তখন বহুবার এমন অবস্থার সামনে পড়েছি যে, কখনও এমন জায়গায় সিট পড়েছে যার পাশেই হয়ত ছোট সন্তানসহ কেউ একই সাথে ভ্রমণ করছে। তখন দেখেছি ট্রেন কোনো ষ্টেশনে থামলে ফেরী করে পাকা কলা বা অন্য খাবার কিছু বিক্রি করতে দেখলেই ছোট বাচ্চা ছেলেরা তাদের মা বাবা তা কিনে দেয়ার জন্যে বলেছে, এমনকি কান্না পর্যন্ত শুরু করেছে। এরূপ বাসে ফেরী পার হওয়ার সময়ও বহুবার দেখেছি। এর পর আমি নিজে সেই খাবার কিনে খাই সব বাচ্চাদের হাতে দিতে গিয়েছি কিন্তু তারা যে জিনিসের জন্য কাঁদছে ঠিক সেই জিনিসই আমি দিতে গেলাম তা নিচ্ছে না। এরপর তার মা যখন তাকে বলেছে নিতে, তখন হয়ত নিয়েছে। কিন্তু মা বাবা বলার পূর্বে কেউ (কোনো বাচ্চা) কিছু হাতে নিতে চায় না। এটা কেন হয়? এরও কারণ উপলব্ধি করা দরকার। এটা এজন্য হয় যে আল্লাহ মানব প্রবৃত্তিকে এমনভাবেই তৈরী করেছেন যে, যা আমাকে দেয়ার দায়িত্ব মা বাপের তা আমি অন্যের কাছে চাইবই বা কেন? এবং অপরে তা আমাকে দিবেই বা কেন? আর তা দিলে মা – বাপের অনুমতি ছাড়া তা আমি নেবইবা কেন। ঠিক এ কারণে আল্লাহ্ও বলেন আমার কাছে যখন কিছু চাইবে তখন আমি তোমাদের যা হই তাই বল আগে আমাকে

www.pathagar.com

একটা ডাক দাও তারপর আমার নিকট চাও, আমি তখন বুঝব যে, আমাকে রব বলে ডাক দিয়ে আমার বান্দা যখন আমার কাছে কিছু চাচ্ছে তখন আমাকে তা দিতেই হবে। আর আমি না দিলে ওদের আর তো কেউ দেনে ওয়ালা নেই। কাজেই আমার বান্দার চাহিদা আমাকেই পূরণ করতে হবে এবং আমার বান্দা যখন রব বলে ডাক দিয়ে আমার নিকট মাফ চায় তখন আমি মাফ না করলে আর কে আছে যে ওদের মাফ কারবে। কাজেই আমার বান্দা যেমন আমাকে রব বলে ডাক দিয়ে আমার নিকট মাফ চায় তখন আমি মাফ না করলে আর কে আছে যে ওকে মাফ কারবে কাজেই আমার বান্দাহ্ যেমন আমাকে রব স্বীকার করে গুনাহ মাফ চচ্ছে তখন তা আমাকেই মাফ করতে হবে। এ জন্যই আমরা ..... বলে আল্লাহকে রব বলে একটা ডাক দিয়েই আমাদের যা চাওয়ার দরকার তা চাই। এ হচ্ছে রব্বানা বলে মুনাজাত শুরু করার হাকিকত। এরপরও লক্ষণীয় আমরা বাচ্চা অবস্থায় নির্মল প্রকৃতিগত অবস্থাকে বড় হয়ে শয়তানের ওয়াস্ ওয়াসায় হারিয়ে ফেলি, একটা ছোট্ট বাচ্চা তাকে তার মা-বাপ ছাড়া অন্য কেউ কিছু দিলেও তা নিতে চায় না, অন্যের কাছে চাওয়া তো দূরের কথা, অনুভূতি যদি বড় হলেও থাকে যে, যা দেয়ার দায়িত্ব আমার রবের তা আমি চাইব আমার রবের কাছেই। অন্যের কাছে তা আমি চাইব কেন? কিন্তু সেই অনুভূতি এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যে, এখন এ মুসলমানরাই তার রবের নিকট কিছু না চেয়ে এমনকি মরা লাশের কাছেও তারা অনেক কিছু চায়। এজন্যেই নিজের ঘরে আপনি রবের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও পাশপোর্ট করে ভিসা নিয়ে ভারতে গিয়ে খাজাবাবার কবরের কাছেও মানুষ কিছু চায়। মানুষকে রব উল্লেখ করেছেন। তাই বলব যতদিন পর্যন্ত আমরা রবকে রব বলে সত্যিকারভাবে মানতে শিখব না ততদিন পর্যন্ত আমাদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। এ সত্য কি আমাদের মাথায় ঢুকবে?

www.pathagar.com

আল্লাহ্ সব মানুষের মালিক বা বাদশাহ্

আমরা مَلِكِ النَّاسِ শব্দ থেকে বুঝলাম যে, সব মানুষেরই একই বাদশাহ। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং আরো বুঝা গেল ইসলামে মানুষের ওপর মানুষ বাদশাহ্ স্বীকার করো না, এ জন্যেই হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে রোমের রাষ্ট্রদূত গিয়ে যখন জিজ্ঞেস করেছিল اَيْنَ مَلِكُكُمْ তোমাদের বাদশাহ কোথায়? তার জবাবে তারা (উপস্থিত লোকেরা) বলেছিল مَالَنَا مَلِك بل لنا امير আমাদের কোনো বাদশাহ্ নেই বরং আমদের একজন আমীর আছেন। অর্থাৎ ইসলামে মানুষের ওপর কোনো মানুষ বাদশাহ নেই, আর ইসলাম তাকে স্বীকার করে না। কারণ আল্লাহ্ যেখানে বলেছেন যে, তিনিই اِلٰهِ النَّاسِ বা সব মানুষের মালিক বা বাদশাহ মানুষ যদি মানুষকে বাদশাহ্ বলে মানে তবে সে আল্লাহ্ বাদশাহ্র হুকুম মানবে না কি মানুষ বাদশাহ্র হুকুম মানবে। মানুষ পড়ে যাবে দোটানা অবস্থায় তখন তাকে বাধ্য হয়ে মানুষ বাদশাহর হুকুমে চলতে হবে যদিও তা আল্লাহ বাদশাহর হুকুমের বিপরীত হয়। এ কারণেই মানুষের ওপর একদিকে থাকবে আল্লাহ বাদশাহ। তিনিই থাকবেন মানুষের জন্যে আইনদাতা আর বিধানদাতা, সেখানে মানুষকেও যদি মানুষের ওপর বাদশাহ বানিয়ে নেয়া হয়, তবে মানুষ যেখানেই দেখবে যে, আল্লাহ বাদশাহর হুকুম মানতে গেলে মানুষ বাদশাহর হুকুম অমান্য করতে হয় আর মানুষ বাদশার হুকুম মানতে গেলে আল্লাহ বাদশার হুকুম অমান্য করতে হয়। সেখানেই মানুষ আল্লাহ বাদশাহর হুকুম পালন করতে পারে না, পালন করে বা মেনে চলে মানুষ বাদশাহর হুকুম। ফলে সে দেশের মুসলমান জনসাধারণ যত বড়ই পরহেজগার হোক না কেন তাকে মানুষ প্রভুরই হুকুম মেনে চলতে হবে। ফলে চেহারা সুরতে তাকে পরহেজগার মনে হলেও বাস্তবে তারা আল্লাহর বান্দা হওয়ার পরিবর্তে মানুষ বাদশাহর বান্দা হয়ে পড়ে। এ কারণেই হুজুর (স) মানুষ বাদশাহর হুকুম মানার হাত থেকে মানব গোষ্ঠীকে উদ্ধার করার জন্যে সংগ্রাম করেছেন মার খেয়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, তারপর মানুষকে মানুষ বাদশাহর হুকুম মানার হাত থেকে উদ্ধার করেছেন, যার জন্যে আল্লাহর

www.pathagar.com

রসূল (স)–কে একটানা ২৩ বছর বিরামহীন সংগ্রাম করতে হয়েছে। আর এ সংগ্রাম আমাদের জন্যেও ফরয যেমন ছিল রসূল (স)–এর জন্যেও ফরয। আর এ ফরজ নামায আদায় করা ফরজের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। যদি শুধু নামায করা ফরয পালন করলেই ইসলামের ফরয কাজ আদায়ের দায় দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যেত তাহলে আল্লাহর নবীর দাঁত ভাঙ্গার, যুদ্ধ করার, হিজরত করার ইত্যাদি জীবন যাওয়ার মত ঝুঁকিপূর্ণ পথে পা বাড়ানর কোনোই দরকার ছিল না। রসূল (স)–এর এসব কথা কি আমাদের মাথায় এখনও ঢুকবে না? আশা করি এবার থেকে ঢুকবে।

সব মানুষের ইলাহ একমাত্র আল্লাহই

এরপর একই সূরার মধ্যে আল্লাহ বলেছেন, তিনি..... সব মানুষেরই ইলাহ বা সার্বভৌমত্বের মালিক। আর সার্বভৌমত্ব যদি আল্লাহর হয়ে যায় তাহলে মানুষ কি করে সেই একই ক্ষমতার মালিক হতে পারে। এটাও আমাদের সুস্থ মাথায় ভেবে দেখা দরকার আছে। আর এর ওপর আমার লেখা বই 'আয়াতুল কুরসির তাৎপর্য' যখন আপনাদের খেদমতে পূর্বেই পেশ করা হয়েছে এবং এরপরও ইলাহ্ হিসাবে আল্লাহর পরিচয় নামক বইয়ের মধ্যেও যখন একবার বলে রেখেছি সেই জন্যে এখানে আর একই বিষয়ের ওপর বেশী লিখলাম না।

তাহলে এ আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর সাথে আমাদের এই বিশেষ তিন সম্পর্ক ঠিক রেখেই জীবনযাপন করতে হবে। আর এভাবে জীবনযাপন করার পথে যদি কোনো বাধা দেখা যায় তবে রসূল (স)–এর ন্যায় জীবন দিয়ে হলেও সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে এবং সংগ্রাম করেই ইসলামের ওপর টিকে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ সংগ্রাম চলছে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম দেশে। বাংলাদেশেও এ সংগ্রামে রত রয়েছে জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রশিবির, ছাত্রীসংস্থা ও অন্যান্য ছাত্র ও বয়স্ক আলেম ওলামাদের বিভিন্ন নামের ইসলামী সংস্থা। এরা সংগ্রামে রত রয়েছেন একমাত্র আল্লাহর হুকুম মানার জন্যেই।

www.pathagar.com

শয়তানের নাম সূরা ও আয়াত নং সহ নিম্নে দেয়া হল —

আগ্রহী পাঠক পাঠিকাগণ কুরআন থেকে সহজে আয়াতগুলো বের করে পড়ে দেখতে পারেন।

সূরার নং	সূরার নাম	শয়তান নামের আয়াত নাম্বার
২।	সূরা আল বাকারা	১৪, ৩৬, ১৬৮, ২০৮, ২৬৮, ২৭৫, ১০২,
৩।	সূরা আলে ইমরান	৩৬, ১৫৫, ১৭৫
৪।	সূরা আন নিসা	৩৮, ৬০, ৭৬, ৮৩, ১১৯, ১২০, ১১৭
৫।	সূরা আল মায়েদা	৯০. ৯১
৬।	সূরা আল আন্‌য়াম	৪৩, ৬৮, ১৪২, ৭১, ১১২, ১২১
৭।	সূরা আল আরাফ	২০, ২২, ২৭, ১৭৫, ২০০, ২০১, ৩০, ৫৩, ৬৪
৮।	সূরা আল আনফাল	১১, ৪৮
১২।	সূরা ইউসূফ	৫, ৪২, ১০০
১৩।	সূরা আর রাআদ	১৭
১৪।	সূরা ইবরাহিম	২২
১৬।	সূরা আন নাহল	৬৩,৯৮
১৭।	সূরা বনি ইসরাঈল	২৭
১৮।	সূরা আল কাহাফ	৬৩

www.pathagar.com

সূরার নং	সূরার নাম	শয়তান নামের আয়াত নাম্বার
১৯।	সূরা মরিয়াম	৪৪, ৪৪, ৪৮, ৮৩
২০।	সূরা ত্বহা	৪৫, ১২০
২০।	সূরা আল আম্বিয়া	৮২
২২।	সূরা আল হাজ্ব	৩, ৫২, ৫২, ৫৩
২৩।	সূরা আল মুমেনুন	৯৮
২৪।	সূরা আন্ নূর	২১, ২১
২৫।	সূরা আল ফুরকান	২৯
২৬।	সূরা আশ শোয়ারা	২১০, ২২১
২৭।	সূরা আন্ নামল	৫, ২৪
২৮।	সূরা কাসাস	১৫
২৯।	সূরা আন্কাবুত	৩৮
৩১।	সূরা লোকমান	২১
৩২।	সূরা আস্সাজদা	২০
৩৪।	সূরা আস সাবা	৬২
৩৫।	সূরা আল ফাতের	৬
৩৭।	সূরা সাফ্ফাত	৭, ৬৫
৩৮।	সূরা সোয়াদ	১৪, ৩৭

www.pathagar.com

সূরার নং	সূরার নাম	শয়তান নামের আয়াত নাম্বার
৪১।	সূরা হামীম আস্ সাজদা	৩২
৪৩।	সূরা আয যুখ্রুফ	৩৬
৫৮।	সূরা আল্ মুজাদালা	১০ ১৯
৫৯।	সূরা আল হাশর	১৬
৬৭।	সূরা আল মুলক	৫
৭৪।	সূরা আল মুদ্দাসসির	২৫
৮১।	সূরা আততাকবীর	২৫
সূরা নং	**সূরার নাম**	**ইবলিসের নামের আয়াত**
২।	সূরা আল বাকারা	৩৪
৭।	সূরা আল আরাফ	১১
১৫।	সূরা আল্ হিজ্র	৩১,৩২
১৭।	সূরা বনি ইসরাঈল	৬১
১৮।	সূরা আল কাহাফ	৫০
২০।	সূরা ত্বহা	১১৬
২৬।	সূরা শোয়ারা	৯৫

www.pathagar.com

৩৪।	সূরা আস সাবা	২০
৩৮।	সূরা সোয়াদ	৭৪,৭৫
সূরার নং	**সূরার নাম**	**খান্নাস নামের আয়াত**
১১৪।	সূরা নাস	৪ নং আয়াত
সর্বমোট ১০১ বার শয়তানের নামের আয়াতগুলো দেয়া হল।		

সমাপ্ত

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫